Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.25-30
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উত্তর-পূর্ব ভারতের গল্প : প্রসঙ্গ নারীর কলমে নারী নির্যাতন

ডঃ সুপেন্দ্র নাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক, রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম
কনিকা রায়
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

In today's society, torture and rape of women have taken horrific forms. A little research shows that women are being raped every day in any part of the world. Protest, resistance and movements are also taking place against this brutal torture. Since literature is a mirror of society, writers have also portrayed this decaying aspect of society in their literature in various ways. The writers of North-East India also did not remain silent in this regard. Women writers in particular need to be mentioned separately. They show in their stories how everyone from a child to an old woman is being raped. The storytellers of this region have also seriously considered the aspect of mental rape. We will try to show here how the female storytellers of this land have highlighted various aspects of violence and rape against women in their stories.

Keywords: Torture, Rape, Little Child, Old Woman, Wise Woman, Story.

ভূমিকা: আজকের দিনে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ এমন একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এটি যেন সমাজের একটি সাধারণ খবরে পরিণত হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই অত্যন্ত ভয়ংকরভাবে বেড়ে চলেছে এই পাশবিক ব্যাধিটি। হাটে-বাটে-ঘরে-বাইরে-কর্মস্থলে-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অহরহ নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। একিই মেয়ে – সে যখন পিতার গৃহে থাকছে তখন সে পিতার দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে। সে যখন স্বামীর গৃহে যাচ্ছে তখন সে শ্বশুরের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে। আবার সে যখন প্রয়োজনে গৃহের বাইরে যাচ্ছে তখন বাইরের লোকের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে। এক বছরের একটি ফুলের মতন শিশু থেকে শুরু করে ৭০ বছরে বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউই রেহাই পাচ্ছে না ধর্ষণের কবল হতে। যখন এই খবরগুলি আমরা শুনি বা দেখি তখন একজন সংবেদনশীল মানুষ হয়ে নিশ্চয় অত্যন্ত মর্মাহত হই। এই পাশবিক নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলন হয়েছে। ধর্ষকদের শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ডও হয়েছে। কিন্তু নির্যাতন কি কমেছে? ধর্ষণের হার কি কমেছে? বরং বেড়েই চলেছে। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত হবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা গল্পে বিশেষ করে মহিলা লেখকদের গল্পে কীভাবে নারী-নির্যাতনের দিকগুলি বহুমাত্রিকভাবে উঠে এসেছে। গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্য

(১৯৫৩), ঝুমুর পাণ্ডে(১৯৬২-), শীলা মজুমদার, সুনন্দা নন্দী পুরকায়স্থ, ইন্দিরা দেবরায়, নন্দিতা ভট্টাচার্য এঁরা প্রত্যেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতের কথাকার। এঁদের নির্বাচিত গল্পগুলিকে অবলম্বন করেই আলোচ্য বিষয়টি আবর্তিত হবে।

উদ্দেশ্য:

(ক) উত্তর-পূর্ব ভারতের মহিলা গল্পকারেরা নারী নির্যাতন ও ধর্ষণকে কোন্ দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেছেন তা তুলে ধরা।

(খ) নারীর বেদন নারীর কলমে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার অনুসন্ধান করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

স্বপ্না ভট্টাচার্য, ঝুমুর পাণ্ডে, শীলা মজুমদার, সুনন্দা নন্দী পুরকায়স্থ, ইন্দিরা দেবরায় ও নন্দিতা ভট্টাচার্য- এই পাঁচজন গল্পকারের নির্বাচিত গল্পগুলিকে অবলম্বন করে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে আলোচ্য প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হবে।

নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের পরিসংখ্যান:

১৮ অক্টোবর ২০২০ সালে বাংলাদেশের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ষণ অপরাধের নিরিখে বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা। সে দেশের প্রায় ৯১% নারী ধর্ষণের শিকার হয়। শিশু নির্যাতনের দিক দিয়ে গোটা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় স্থানে আছে সুইডেন। সুইডেনে প্রতি বছরই প্রায় ৫৮% নারী ধর্ষণের শিকার হয়। পিছিয়ে নেই ভারতও। উইকিপিডিয়া থেকে জানা যাচ্ছে ২০১৯ সালে ভারতে ৩২০৩৩ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘতেছে। সুতরাং, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ যে সারা বিশ্বের সমস্যা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরিদর্শন:

আসাম তথা বরাকবঙ্গের গল্পভুবনের একটি উল্লেখযোগ্য নাম ঝুমুর পাণ্ডে(১৯৬২-) তাঁর অধিকাংশ গল্প মূলত চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবন নিয়ে নির্মিত। তবে গল্পকারের 'উহাদের কথা' নামের সমগ্র গল্পটির পরিসর জুড়ে রয়েছে শুধুই ধর্ষণের রূপকথা। আসলে সমগ্র সমাজ জুড়ে যখন ধর্ষণের খেলা চলছে তখন তাঁর গল্পে শুধুমাত্র ধর্ষণের দৃশ্য থাকাটাই স্বাভাবিক। গল্পটি কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম দৃশ্যে দেখি শিলচর স্টেশনের কাছে একজন ভিক্ষুক বৃদ্ধাকে ধর্ষিত হতে। ৬৫-৭০ বয়সের এই বৃদ্ধার ওপর- "কাল রাতভর ওরা কী যে অত্যাচার করল শরীরের উপর। ছেলের বয়সী, নাতির বয়সী ছেলেগুলো বুড়ো কুচকানো শরীরটার উপর যেন দৈত্যের মতো হামলে পড়ল।...আহারে নাতির বয়সী ছেলেগুলো। ছি ছি কি লজ্জা!"[১] একজন ভিক্ষুক বৃদ্ধার এই ছি ছি রবে আমাদের ভদ্রতার মুখোশ সত্যিই খুলে যায়। গল্পটির নিবিড় অধ্যয়নে দেখি এখানে বৃদ্ধার কোনো নাম নেই। কেন? বৃদ্ধা নামহীন কেন? আসলে এত অসংখ্য বৃদ্ধা প্রতিদিন সমাজে ধর্ষিত হচ্ছে যে, তাদেরকে কোনো একটি নির্দিষ্ট নামের মাধ্যমে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা একেবারেই কঠিন। 'উহাদের কথা' গল্পে ঝুমুর পাণ্ডে সেটিই করে দেখালেন।

গল্পটির দ্বিতীয় দৃশ্যটিতে যে ধর্ষিত গৃহবধূটির কথা গল্পকার উল্লেখ করেছেন সেই গৃহবধূটিও কিন্তু নামহীন। অর্থাৎ, এই গৃহবধূটিও সকল ধর্ষিত গৃহবধূদেরই প্রতিনিধি। ঝুমুর পাণ্ডে এখানে ধর্ষণের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন প্রতীকের মধ্য দিয়ে। গল্পে দেখি গণধর্ষণের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গৃহবধূটি বমি করতে বাধ্য হয়। আসলে এই বমি তো বমি নয়। এই বমিই হল সংকেত বা প্রতীক। এই বমি নারী-মাংসলোলুপ পুরুষ সমাজের প্রতি চরম ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ।

বলপ্রয়োগ করে স্ত্রী-যৌনাঙ্গের দখল নিলেই কি তাকে ধর্ষণ বলে? সমাজ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি বোধ হয় এই মতই পোষণ করে। কিন্তু গল্পকার ধর্ষণের এই সংকীর্ণ সংজ্ঞাকে সমর্থন করেন না। কেন করেন না? আমরা কি সমাজের অন্যায়-অবিচার দেখে মানসিকভাবে অহরহ ধর্ষিত হই না? যে মানুষটি তার সুহৃদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল তাকে কি ধর্ষণ বলব না? অনেক সময় কোনো ব্যক্তির কোনো অযাতিত আচরণে বা মন্তব্যে আমরা এমনভাবে জর্জরিত হই যে, মনে হয় যেন ধর্ষিত হলাম। অর্থাৎ, যারা শারীরিকভাবে নারীদের অত্যাচার করে তারাও যেমন ধর্ষক তেমনি যারা মানসিকভাবে অত্যাচার করে তারাও ধর্ষক। এদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। গল্পটির তৃতীয় দৃশ্যে ঝুমুর পাণ্ডে এই মতই ব্যক্ত করলেন। সকল ধর্ষিত মেয়েদের প্রতিনিধি তৃতীয় দৃশ্যের নামহীন মেয়েটি তাই বলে, "কাল যারা ওকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেল ওদের হয়তো শাস্তি হবে। কিন্তু শতদলের? শতদল কি ওর মনটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খায়নি? কালকের ধর্ষক আর শতদলের মধ্যে কীসের ফারাক! ওদের এখন একই জায়গায় বসিয়ে থুথু ফেলতে ইচ্ছে হল মেয়েটার।"[২]

গল্পের চতুর্থ দৃশ্যটি আরও নির্মম। এই সমাজে চাঁদের কণার মতো শিশুরা যে প্রতিদিনই ধর্ষিত হচ্ছে এই দৃশ্যটি তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ৫ বছরের এই শিশুটি ধর্ষককে কাকু বলে ডাকে। এখানে শিশুটির মতো কাকুটিও নামহীন। কারণ এই কাকুটি সমাজের অসংখ্য ধর্ষক কাকুদেরই প্রতিনিধি। হতে পারে গল্পের কাকু কোনো প্রতিবেশী কাকু, দোকানি কাকু, রিক্সাওয়ালা কাকু, অটোওয়ালা কাকু কিংবা আপন কাকু। যারা প্রতিদিন নির্যাতন করছে শিশুদের। গল্পকার লিখেছেন, "আহারে, ছোট্ট শরীরটায় এত ব্যথা সহ্য হচ্ছে না। ছোট্ট দু-উরুর মাঝখান দিয়ে নামছে রক্তের ধারা। উরুগুলো কামড়ে-কামড়ে... আহারে, শিশু স্তনের রেখায়ও কামড়। শিরশির বাতাসে গাছের ডালপাতা বড় করুণভাবে নড়ে।"[৩] শিশুর এই নির্মম ধর্ষণকাণ্ড দেখে প্রকৃতিও করুণা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। মানুষ হয়েও আমরা যখন এই জঘন্য কর্মের প্রতিরোধ করতে অপারগ তখন প্রকৃতির এই করুণা প্রকাশে আমরা লজ্জার নর্দমায় নিমজ্জিত হই। গল্পটির পঞ্চম দৃশ্যে নারীমুক্তির মিছিলটিকে লেখকের কাছে তাই গুরুত্বহীন বলে মনে হয়। লেখক লিখেছেন, "মিছিলটা এখন বুড়িটার সামনে দিয়ে, বউটার পাশ ঘেঁষে, মেয়েটাকে বাঁয়ে রেখে, শিশুটার প্রায় কাঁধ ঘেঁষে যাচ্ছে....।"[৪] নারী-নির্যাতন হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বরূপ মিছিল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পকার ঝুমুর পাণ্ডে নারী-মুক্তি বিষয়ক এই মিছিলগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবালেন।

আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। দিনের শুরু থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত আমরা বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মর্ত্য ছেড়ে মঙ্গলেও পৌঁছে গেছে বিজ্ঞানের সাফল্য। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ কি বিজ্ঞান-মনস্ক? না। আসলে বিজ্ঞানচেতনা দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে

সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ নাগরিক এখনও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। তা না হলে কেন আজও আমরা ডাইনি প্রথা দেখব? ডাইনি বলে কেন আজও নারীদের মেরে ফেলা হবে? তবে ডাইনি তৈরি হওয়ার পেছনে একটি প্রধান কারণও রয়েছে। সেটি হল পরিবার কিংবা সমাজের কাছে আমরা 'মানুষ' না হয়ে যখন 'বোঝা' হই তখনই আমরা ডাইনিতে পরিণত হই। আমাদের বেঁচে থাকার নূন্যতম চাহিদাগুলি যখন পরিবার কিংবা সমাজ দিতে অপারগ হবে তখনই আমরা ডাইনি হই। গল্পকার শীলা মজুমদারের 'হায় তমসা' গল্পে নম্র-ভদ্র স্বভাবের নমিতার ডাইনি হওয়ার পেছনে আলোচ্য কারণ দুটিই দায়ী। তার বৌদি তাকে এক ধরনের উটকো বোঝা বলেই মনে করত। ফলে একদিন গ্রামের জনগণ এই 'ডাইনি' নমিতাকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। কিন্তু গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার পরেও কেন গ্রামের গুন্ডা ছেলেরা নমিতাকে ধর্ষণ করল? ঘুরে-ফিরে আসে সেই একই কারণ। আসলে ডাইনি হল নারীকে শোষণ করার কিংবা ভোগ করার একটি পিতৃতান্ত্রিক হাতিয়ার। গল্পকার শীলা মজুমদারের কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি ডাইনি সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবালেন। গল্পটিতে দেখি নমিতা যে গ্রামে থাকে সে গ্রাম নামহীন। মোদ্দাকথা এ গ্রাম দেশের সকল অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত থাকা গ্রামগুলিরই প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে গীতা দেবনাথ যথার্থই বলেছেন, "নমিতার দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবনের কথা লেখিকা সংযত লেখনীতে সমাজের ক্লেদাক্ত চেহারা তুলে ধরেছেন। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আজও ডুবে আছে গ্রাম-ভারতের অজস্র মানুষ।"[৫]

আসামের বাংলা গল্পের অন্যতম প্রতিভাবান গল্পকার হলেন সুনন্দা নন্দী পুরকায়স্থ। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় নারীরা যে কতভাবে নির্যাতিত হচ্ছে গল্পকার সুনন্দা নন্দী পুরকায়স্থের 'মিথ্যা-মা' গল্পটি তারই একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। আলোচ্য গল্পটিতে নারী নির্যাতনের একটি ভিন্ন আখ্যান নিয়ে তিনি হাজির হলেন। তিনি এখানে দেখালেন নারীর গর্ভকেও পুরুষরা কীভাবে অর্থ রোজগারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। নারী নির্যাতনের এরূপ ধরণ সত্যিই কল্পনাতীত। যে গর্ভকে অধিকাংশ নারী তাদের সকল আনন্দের আধার বলে মনে করে সেই গর্ভকেই নিবারণের মতো স্বামীরা যখন লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় তখন এর চেয়ে চরম শোষণ আর কিই বা হতে পারে! গল্পকার সুনন্দা নন্দীর আলোচ্য গল্পটি পাঠ করে সকল পাঠক বাধ্য হন অশ্রু বিসর্জন করতে।

বরাক উপত্যকার একজন অতি পরিচিত গল্পকার হলেন স্বপ্না ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর 'রসকলি' গল্পটিতে নারী নির্যাতনের একটি ক্রমবর্ধমান দিক আমাদের সামনে হাজির করলেন। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আমরা এত বেশি করে আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছি যে, শুধুমাত্র স্ত্রী-সন্তান নিয়েই বেঁচে থাকতে চাচ্ছি। জন্মদাতা মা-বাবাকে উটকো মনে করছি। পাড়া-প্রতিবেশী তো দূরের কথা। ফলে যে মা আমাদের গর্ভে ধারণ করেছেন সেই মা-কে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্যে তাকে নির্যাতন করছি। ফলে সন্তানের হাতে নির্যাতিত হতে হতে অত্যাচারিত মা একদিন চোখের জলে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু বাড়ির বাইরেও যে ওত পেতে বসে আছে কুসন্তানেরা। ফলে এক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে মায়েরা আর এক নির্যাতনের মুখে পড়েন। 'রসকলি' গল্পটি এই রকমই এক অত্যাচারিত মায়ের আখ্যান । বউমার গঞ্জনা আর ছেলের হাতে পীড়িত হয়ে মা তারামণি একদিন ঘর ছাড়েন। কিন্তু এই গৃহত্যাগ তার জীবনে ভয়ংকর শাপ হয়ে নেমে আসে। গৃহত্যাগের

কিছুদিন পর তারামণিকে পাওয়া যায় ধর্ষিত আর মৃত অবস্থায়। গল্পের শেষে গল্পকার লেখেন, "আজকের খবরের পাতার তিন নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা- গত শনিবার সুতারকান্দি বর্ডারের কাছে গ্রামের ভেতরে ঝোপের মধ্যে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সম্ভবত গণধর্ষণের পর তাকে খুন করা হয়েছে। বৃদ্ধার কপালে রসকলি ও গলায় তুলসীর মালা ...।"[৬] এখানে 'আজকের' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শব্দটি ব্যঞ্জনাময়। আসলে এ 'আজ' শুধু আজকের 'আজ' নয়। এ 'আজ' যেমন গতদিনের 'আজ', তেমনি আগামীদিনেরও 'আজ'। অর্থাৎ, প্রতিদিই আমরা খবরের ১ নম্বর অথবা ২ নম্বর অথবা ৩ নম্বর অথবা ৪ নম্বর পাতায় নারী ধর্ষণের সংবাদ দেখি। গল্পটিতে রসকলি আর তুলসীর মালা প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, রসকলি আর তুলসীর মালা পরিধান করেও যে নারী ধর্ষণ প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্য যেন একথাই আমাদের জানান দিতে চেয়েছেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্যের অপর এক ভুবন। এই অপর ভুবনের বাংলা গল্পবিশ্বের অন্যতম গল্পকার হলেন ইন্দিরা দেবরায়। তাঁর 'স্কন্ধনাশার উপাখ্যান' একটি বধূ-নির্যাতনের গল্প। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিবাহের পর মেয়েদেরকে সাধারণত স্বামীর ঘরে থাকতে হয়। এতদিনের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে স্বামীর ঘরে থাকাটা সত্যিই অত্যন্ত বেদনার ও কষ্টের। তাই নববধূকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। কিন্তু স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা তো দূরের কথা, স্বামী-গৃহে নববধূদেরকে প্রতিদিনই শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়। ফলে বধূরা বাধ্য হন আত্মহত্যা করতে। আলোচ্য গল্পের শ্রাবন্তী অবশ্য আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু তার বেঁচে থাকা আর না থাকা দুটিই সমান। পিতার গৃহে অত্যন্ত আদরের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে শ্রাবন্তী। কিন্তু স্বামীর গৃহে এসে প্রতিনিয়ত তাকে শাশুড়ির লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে হয়। তাই শ্রাবন্তীর মনে হয়, "চির অন্ধকার এক স্যাঁতস্যাঁতে গলির ভেতরে যেন গড়িয়ে পড়ল সে। শাশুড়ির তীব্র চিৎকার কানে যেতেই কষ্ট, অভিযোগ, অভিমান-যন্ত্রণা ও বেদনার ঢল নেমে এল।"[৭] এখানে 'চির অন্ধকার' শব্দ দুটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শব্দ দুটি যেন চিরকাল ধরে চলে আসা বধূ-নির্যাতন নামক অন্ধকার জগতের কথাই বলতে চেয়েছে।

গল্পকার নন্দিতা ভট্টাচার্যের গল্পটি 'ভোরের শিউলি' যেন আলোচ্য গল্পগুলিরই উপসংহার। গল্পের নামটিও ব্যঞ্জনাময়। আসলে এ শিউলি ভোরবেলা ঝরে পড়া শিউলি ফুল নয়। কিন্তু গল্পের শিউলি নামক মেয়েটির জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে যেভাবে এ ধরনের উপমা লেখক হাজির করলেন তা সত্যিই চমৎকার। তবে শুধুমাত্র ভোরেবেলাতেই নয়। সব বেলাতেই শিউলিদের ধর্ষণ করে খুন করা হচ্ছে। বড় হওয়া তো দূরের কথা, এদের বেঁচেই থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই গল্পকার যদি গল্পের নামটি শুধুমাত্র 'শিউলি'ও রাখতেন তবুও নামকরণটিও বোধ হয় সার্থক হত। এ প্রসঙ্গে গীতা দেবনাথ যথার্থই বলেছেন, "ভোরের শিউলি' আমাদের বীভৎস কুৎসিত দিকগুলি তুলে ধরে। এক নিষ্পাপ কিশোরীর জীবন শেষ করে দেয় মানুষ নামধারী পশুরা। 'ভোরের শিউলি' ভোর হতে না-হতেই ঝরে পড়ে।"[৮] গল্পকার এখানে দেখালেন যারা ধর্ষণ করে তারা ধর্ষকই, মানুষ নয়। এদের কাছে মা-বোন-মাসি-পিসি-ঠাকুমা বলে কিছু হয় না। গল্পকার নন্দিতা ভট্টাচার্যের কথায় এই ভাষ্যই আমরা শুনতে পাই। তাই নির্মলের মুখ দিয়ে তিনি বললেন , "দিদিমণি গো! হেরার কি মা-মাইয়া নাই!"[৯]

উপসংহার: অতএব, কোথাও নিরাপদ নয় নারীরা। ঘরে পিতা-কাকা-দাদার দ্বারা তারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। বাইরে? বাইরের জগৎটা আরও ভয়ংকর। তাহলে নারীদেরকে কি সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখতে হবে? এটি এক ধরনের নোংরামো। পাহারা দিই আমরা আমাদের সম্পত্তিগুলিকে। নারীরা কি সম্পত্তি? নিশ্চয় নয়। তাহলে কী সেই মুক্তির দিশা? যে দিশা নারী-শোষণকে চিরতরে মুছে ফেলতে পারবে? আসলে আমরা এমন একটি সমাজব্যবস্থায় বেড়ে উঠি যে সমাজব্যবস্থা আমাদের তাড়িত করে নারীদেরকে আড়চোখে দেখতে। পরিবর্তন দরকার এখানেই। আমরা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থায় বাস করব যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। পুত্র সন্তান জন্মানোর পর থেকেই তাকে এমনভাবে দেখা হয় যে, আমরা প্রমাণ করতে চাই সে বিশেষ কিছু। অথচ নারী সন্তানের বেলায় আমরা সেই বিশেষ কিছু করতে চাই না। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত বদল না হলে আগামী দুনিয়া ক্রমে যে নারী-শূন্যতার দিকে ধাবিত হবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর গল্পকার নন্দিতা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে আমরা যেন সেই ভয়বাণীই শুনতে পাই। 'ভোরের শিউলি' গল্পে তাই তিনি বললেন, "আমি যে বিসর্জনের বাজনা শুনতে পাচ্ছি।"[১০]

সূত্রনির্দেশ :

১. দেব দেবব্রত (সম্পাদক): মুখাবয়ব, আগরতলা ও কলকাতা, প্রকাশকাল- বৈশাখ-আষাঢ় ১৮২৮, পৃষ্ঠা- ১৪২
২. তদেব, পৃঃ ১৪৫।
৩. তদেব, পৃঃ ১৪৭।
৪. তদেব, পৃঃ ১৪৭।
৫.তদেব, পৃঃ ১৮-১৯।
৬. তদেব, পৃঃ ২৬৬।
৭. তদেব, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬।
৮. তদেব, পৃঃ ১৩-১৪।
৯. তদেব, পৃঃ ৪০৮।
১০. তদেব, পৃঃ ৪০৮।